

মানবিক গুণের বিকাশে সংস্কৃতিচর্চা

শিক্ষা তুহিন রায় ও সারা মনামী হোসেন

লেখকদ্বয় যথাক্রমে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি উক্তি দিয়ে শুরু করতে চাই। তার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে তিনটি— চাকরিজীবী সৃষ্টি করা; সংস্কৃতির ভদ্রলোক সৃষ্টি করা এবং বিবেকবান ও সৃজনশীল মানুষ সৃষ্টি করা। হয়তো প্রথম উদ্দেশ্য অর্থাৎ চাকরিজীবী সৃষ্টি হচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাকি দুটি পথ অর্জন যে সহজ নয় সেটা অনুমেয়। এদিকে ‘সংস্কৃতিচর্চা’ কথাটি শুনলেই কেউ কেউ মনে করেন, গান-বাজনা, নাচ, কবিতা আবৃত্তি মানেই সংস্কৃতিচর্চা। তারা ভুলে যান, আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যা ভাবে, যা বলে, যা করে সবই তার সংস্কৃতির অংশ। একজন মানুষ, দু’জন মানুষ, দশজন মানুষের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড দিয়ে যখন সমাজ এগিয়ে যায়, তখন সেটিই হয়ে ওঠে তাদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কতটা বিশাল, কতটা ব্যাপক তা বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ই বি টেইলরের সংজ্ঞায়ন থেকে বুঝতে পারি। তার মতে, Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of a society. সংস্কৃতিবান হতে গেলে অবশ্যই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে থাকতে হবে। দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের হতে হবে। হতে হবে মূল্যবোধনির্ভর আত্মবিশ্বাসী ও নীতি-নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন। প্রতিটি প্রথা ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সম্যকভাবে জ্ঞান থাকতে হবে কলা ও মানবিকতার। সবচেয়ে বড় কথা, হৃদয়ের চর্চা করতে হবে। হৃদয়ের গভীর থেকেই অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা তৈরি হয়, যা সৃজন বুদ্ধিতে কাজ লাগে। হেগেল বলেছিলেন, ‘প্রচণ্ড আবেগ ভিন্ন কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়নি কোনো কালে।’ প্রতিটি সমাজ-সভ্যতা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। প্রতিটি পরিবর্তনের ফল ভোগ করছে আজকের আধুনিক প্রজন্ম। এই পরিবর্তনের কারণে যেমন তাদের ভালো-মন্দ অর্জন হচ্ছে, আবার কখনও এর ব্যতিক্রমও দেখা যাচ্ছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যে একটি বড় সংকট দেখা যাচ্ছে সেটি নিঃসন্দেহে জঙ্গিবাদ। প্রশ্ন হচ্ছে, এই জঙ্গি কে বা কারা? কেউ তো জন্ম থেকে জঙ্গি হয় না। শিশুদের আমরা বলি, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সেই শিশুরাই পরে বিপথগামী হচ্ছে। এর পেছনের কারণ জানতে হলে প্রথমেই ভাবতে হবে, শিশুর সামাজিকীকরণ হচ্ছে কি-না সেটি দেখা। এর দায়িত্ব নিঃসন্দেহে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে। শিশুটি বড় হয়ে কাদের সঙ্গে মিশছে, কারা তার বন্ধু এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এদের চলাফেরা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবশ্যই বাবা-মাকে খোঁজখবর রাখতে হবে। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের ভূমিকা এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে শিশু

কিশোর ও তরুণদের জীবনের একটি বড় অংশ কাটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায়। শিক্ষকদের ছায়ায়। ডিজিটাল সংস্কৃতির যুগে ছোট-বড় সবার চোখ এখন মুঠোয় বন্দি। তথ্য বলুন আর বিনোদন— সবই হাতের কাছে। এক সময় বাবা-মায়েদের কাছে গল্প শুনতাম, স্কুল ছুটি শেষে তারা হাতে নাটাই-ঘুড়ি নিয়ে ছুটতেন। কখনও গাছে ঝুলে দোল খেতেন।

বাচ্চা কান্দলেই এখন তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুঠোফোন বা ট্যাব। আধুনিক পরিবারের এই জগৎ অনেক সময় এতটাই অন্তঃসারশূন্য যে সামনের মানুষটি চোখের সামনে কীভাবে বদলে গেল তা বোঝারও সময় হয়ে ওঠে না। তাই আমরা বুঝতে পারি না, গান ভালোবাসা ছেলেটা কবে থেকে গান শোনা বন্ধ করে দিল। কবেই বা কিছু দানব তার মনুষ্য দখল করে নিল।



সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে আমাদের সংস্কৃতি এটা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে। মানবতার ধর্মচর্চার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার জায়গায় কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মনোজাগতিক পরিবর্তনটা শিক্ষককে লক্ষ্য করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরকার শক্তিকে আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব তাদের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা। যেখানে সংস্কৃতি হতে পারে বড় নিয়ামক। সাংস্কৃতিক চর্চা হতে পারে বড় হাতিয়ার

এখনকার যুগের ছেলেমেয়েরা সেগুলো শুনলে চোখ বড় বড় করে তাকায়। তারপর মুখ গুঁজে দেয় ছোট পর্দায়। ইট-কাঠের শহরে অবশ্য এর বাইরে ভাবাও দুষ্কর বটে! এ ছাড়া যৌথ পরিবারে এক সময় সবাই মিলে খাওয়া, উৎসবের আয়োজন করা, একজনের সমস্যায় আরেকজনের এগিয়ে আসা ছিল পারিবারিক সংস্কৃতি। এখন অধিকাংশ পরিবারের ‘নিজস্ব’ জগৎ আছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যাচ্ছে, জঙ্গিদলের সঙ্গে যুক্ত তরুণরা বেশিরভাগই অবস্থাপন্ন, বিত্তবান বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা। কেউ কেউ ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে। এটাও বলা হয়েছে, পরিবারের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্নও ছিল। প্রতিটি পরিবার দাবি করছে, তাদের সন্তান ছিল উদ্র, নিরাম স্বভাবের। কেউ আবার গান

ভালোবাসত, কেউ ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এই ছেলেরাই এক সময় হাসিমুখে ছবি তুলে মানুষ মেরে ফেলছে— এর কারণ কী? লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্ধকারের পথে তাদেরই নেওয়া হচ্ছে যারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যাদের অবাধ বিচরণ। সন্তানদের হাতে প্রযুক্তি তুলে দিতে পারলেও সেই প্রযুক্তি সে কোন উদ্দেশ্যে, কীভাবে ব্যবহার করছে সে সম্পর্কে বেশিরভাগ বাবা-মা-ই সচেতন না। প্রযুক্তির প্রসারকে অবশ্য আমরা দায়ী করতেও পারি না। কারণ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভালোটাই গ্রহণ করে।

আজ যখন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন আমাদের ভাবতে হবে শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদের কী দিচ্ছেন, কতটুকু দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তোলা, তাদের মননকে পরিশীলিত করা। শিক্ষকেরা হয়তো শিক্ষার্থীদের মনের জগতে সেভাবে প্রবেশ করতে পারছেন না। আর প্রতিপক্ষ সেই সুযোগটিই কাজে লাগিয়ে চালাচ্ছে মগজধোলাই পর্ব। বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র। সেই বিশাল জগৎকে যেন আমরা সংকীর্ণ না করি সেটা খেয়াল রাখা জরুরি। এখানে শিক্ষকেরা হতে পারেন রোল মডেল। শিক্ষার্থীদের সামনে বইয়ের জগত খুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। শিক্ষা, গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সংগঠনগুলোকে আরও তৎপর করে তুলতে হবে। বিতর্ক, আবৃত্তি, উপস্থাপনা, চলচ্চিত্র গবেষণা— এসব সংগঠনে শিক্ষার্থীরা যাতে অংশগ্রহণ করে সেদিকেও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের গান ও নজরুলের কবিতাকে যে ভালোবাসে, লালনের আধ্যাত্মিকতা কিংবা চার্লি চ্যাপলিনের হাসির পেছনের কান্না কেউ যখন দেখতে পায় তখন সে ভালো কিছু চিন্তা করতে শেখে। মানবমুক্তির সংগ্রামকে বুঝতে শেখে। আমরা তারেক মাসুদের ‘মুক্তির গান’ চলচ্চিত্রে দেখেছি, মুক্তিযোদ্ধারা গান গেয়ে বাংলার মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন। এই গানগুলো শুধু গান নয়, এটি ছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার স্পৃহা। স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনার মন্ত্র। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে আমাদের সংস্কৃতি এটা শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে। মানবতার ধর্মচর্চার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার জায়গায় কাজ করতে উৎসাহিত করতে হবে। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর মনোজাগতিক পরিবর্তনটা শিক্ষককে লক্ষ্য করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরকার শক্তিকে আবিষ্কার করতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব তাদের মানবিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা। যেখানে সংস্কৃতি হতে পারে বড় নিয়ামক। সাংস্কৃতিক চর্চা হতে পারে বড় হাতিয়ার।